Vol. 54 | No. 3 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ফাদার সিয়ের্গি, অহিংসা ও লালসালু : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

Volume	54
Issue	3
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Jannat Ara Sohely
Published online	June 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i3.7
Pages	১৫১-১৬৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ফাদার সিয়ের্গি, অহিংসা ও লালসালু : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

জান্নাত আরা সোহেলী*

সারসংক্ষেপ : সমাজ-সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে ধর্মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রতিযুগে স্বার্থান্ধ কিছু মানুষ ধর্মকে তাদের বৈষয়িক সমৃদ্ধির নিয়ামক হিসেবে ব্যবহার করেছে। ধর্ম ক্রমশ হয়ে উঠেছে অর্থ, ক্ষমতা আর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার কার্যকর অনুষঙ্গ। গির্জা, মন্দির আর মসজিদকে কেন্দ্র করে ফাদার, আশ্রমগুরু, মোল্লা-মৌলবিরা হয়ে উঠেছে সমাজশাসনের শীর্ষব্যক্তিত্ব। ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে ধর্মের মানবিক আবেদন-অনুষঙ্গ। সমাজব্যবস্থায় বিরাজিত এই অশুভ প্রবণতার চিত্রটি সমাজসচেতন লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। লেফ্‌তলস্তয় তাঁর ফাদার সিয়ার্গি (১৯১১) উপন্যাসে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অহিংসা (১৯৪১) উপন্যাসে আর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর লালসালু (১৯৪৮) উপন্যাসে – খ্রিস্টান, হিন্দু ও মুসলমান এই তিন ধর্মের ধর্মনেতাদের অন্তর্গত চালচিত্র উন্মোচনসূত্রে তিন ভিন্ন পট-পরিবেশের ধর্মব্যবসার নিখুঁত ছবি চিত্রিত করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে তিনটি উপন্যাসে ধর্মের নামে তথাকথিত ধর্মগুরুদের আদর্শিক বিচ্যুতির তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

রুশ ঔপন্যাসিক লিয়েফ্ নিকলায়েভিচ্ তল্‌স্তোয়ের (১৮২৮-১৯১০) *আতিয়েৎস্ সিয়ের্গি* নামক আত্মজীবন-দর্শন ভিত্তিক উপন্যাস *ফাদার সিয়ের্গি*, যেটি ১৮৮৯-১৮৯৮ সালের মাঝামাঝি পর্যায়ে রচিত হলেও প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) প্রাকপর্যায়ে।[১] অন্যদিকে, ভারতীয় উপমহাদেশে মহাত্মা গান্ধীর ব্রিটিশবিরোধী অহিংস আন্দোলন যখন উত্তুঙ্গ পর্যায়ে, তখন কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) *অহিংসা* (১৯৪১) *উপন্যাস*; এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরবর্তী পর্যায়ে, যখন ধর্মের ভিত্তিতে নবপ্রতিষ্ঠিত একটি দেশে চলছে সর্বক্ষেত্রে ধর্মান্ধতা তথা ধর্মীয় উন্মাদনা, তখন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) রচনা ও প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস *লালসালু*

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(১৯৪৮)। বলাবাহুল্য তিনটি উপন্যাসই প্রকাশিত হয় বিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে, প্রায় চারদশকের ব্যবধানে। অথচ এ তিনটি উপন্যাসের মজ্জায় মিশে আছে এক অত্যাশ্চর্য সাযুজ্য; এবং তা হলো আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত নায়কের আদর্শ বিচ্যুতির শিল্পিত আখ্যান। আলোচ্য তিনটি উপন্যাসেরই প্লট নির্মিত হয়েছে যথাক্রমে গির্জা, আশ্রম আর মাজারকে কেন্দ্র করে। এসব উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের দুর্বলতাকে পুঁজি করে ধর্মীয় গুরুদের ধর্মব্যবসার নিখুঁত চিত্র। বিষয়ভাবনার সাযুজ্যে তিনজন লেখক তাঁদের ভৌগোলিক দূরত্বকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছেন পরস্পরের শিল্পসহচর। 'লেফ্ তলস্তয়ের *ফাদার সিয়ার্গে*...গল্পের ফাদার সিয়ার্গে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অহিংসা* উপন্যাসের সদানন্দ আর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু* উপন্যাসের মজিদ – খ্রিস্টান, হিন্দু ও মুসলমান এই তিন ধর্মের ধর্মযাজকের কাহিনীর মধ্যে একটি ঐক্য আছে। ... তিন যুগের তিন শিল্পীর ট্রিটমেন্ট তিন রকম। তবে তলস্তয় নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ– পতনের প্রতিটি ধাপ তাঁর কাহিনীতে অকম্প্র রেখায় অঙ্কিত।' (মান্নান সৈয়দ ১৪০৭ : ভূমিকাংশ)।

দুই

ফাদার সিয়ের্গি উপন্যাসের আখ্যান নির্মিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের এক সুদর্শন তরুণ সৈনিকের কাহিনি অবলম্বনে, যিনি সুন্দরী হবু স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে ঘটনাচক্রে রূপান্তরিত হয়েছেন মঠবাসী সন্ন্যাসীতে। বাহ্যিক পৃথিবীর রূপ-রস-কামনা-বাসনা থেকে ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য এই সন্ন্যাসীর ছিল নিরন্তর প্রচেষ্টা। বছরের পর বছর ধরে গুহাবাসী জীবনযাপন, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা, সর্বোপরি নারীর মোহময়ী কামনাকে উপেক্ষার নিমিত্তে যিনি কুঠারাঘাতে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি বিসর্জন দিতে পর্যন্ত এক মুহূর্ত দ্বিধা করেননি; সে-ই সন্ন্যাসী জীবনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সন্ততে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এক সন্ধ্যায় ভক্তনারী-সান্নিধ্যে আত্মবিবশ হয়ে ঘটিয়েছেন কামজ পতন। আত্মধিক্কারে জর্জরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি মঠের বিলাস-ব্যসন, প্রতাপ-ঐশ্বর্য আর অগণিত দর্শনার্থীর স্তুতিবাক্যের মোহ কাটিয়ে নির্বাচন করে নেন সর্বহারার জীবন। আর এভাবেই সাধিত হয় তাঁর আত্মমুক্তি।

যে স্তোপান্ কাসাৎস্কি ছিলেন একসময়ের উচ্চাভিলাষী প্রিন্স, তিনিই এ-উপন্যাসে রূপান্তরিত হয়েছেন গুহাবাসী সন্ন্যাসীতে; এবং সাধনা ও জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে পৌঁছে একপর্যায়ে সাধারণ মানুষের কাছে ফাদার সিয়ের্গি থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন স্তারেৎস্ (গুরু) সিয়ের্গিতে। এক্ষেত্রে অবশ্য কতগুলো ঘটনা উদ্দীপকের ভূমিকা পালন করেছে। সিয়ের্গির প্রভাবে স্বামী পরিত্যক্তা, কামনাবিবশ সুন্দরী মাকোভাকিনার গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করা, অসুস্থ রোগীকে সারিয়ে তোলার মতো অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাপ্রদর্শন প্রভৃতি কারণে চতুর্দিকে সিয়ের্গির মহিমা রটে যায়। অতঃপর যে প্রিন্স মূলত নিজের উচ্চাভিলাষ, অহংবোধ আর জাগতিক মোহ

পরিত্যাগ করে নির্জন-নির্মোহ সন্ন্যাসব্রতকে জীবনের একমাত্র আরাধ্য করে নিয়েছিলেন এবং ধর্মগুরু (ফাদার) হিসেবে নিজেকে লোকালয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনিই একপর্যায়ে উপভোগ করতে শুরু করেন দর্শনার্থীদের সমাগম, স্তুতিবাক্য, তোয়াজ-তোষামোদ। লেখক সিয়েৰ্গির এই আত্মপতনশীল বাস্তবতা চিত্রিত করেছেন নিম্নরূপে :

> লোকজনকে ধর্মোপদেশদান, কি আশীর্বাদ করা, কিংবা রুগ্‌ণের জন্যে প্রার্থনা, অথবা জীবনে সঠিক পথ নির্ধারণে করণীয় কর্তব্যের নির্দেশদান ইত্যাদির সময়ে কিংবা যাদের তিনি রোগ সারিয়েছেন বা সৎপথে এনেছেন তাদের প্রশস্তি শুনতে শুনতে খুশি না হয়ে তিনি পারেন না; লোকের ওপর নিজের প্রভাব, নিজের সুকীর্তির সুফল সম্বন্ধে উৎসাহ না বোধ করে পারেন না। তাঁর মনে হতো, তিনি যেন কোনো জ্বলন্ত আলোকবর্তিকা। ...দর্শনার্থীদের ভিড়ে তিনি হাঁপিয়ে উঠতেন, ক্লান্তি বোধ করতেন ঠিকই, তবু হৃদয়ের গভীরে তৃপ্তি বোধ করতেন, যে-প্রশস্তিতে তাঁর চতুর্দিক ভরে থাকত তাতে আনন্দ পেতেন। (হায়াৎ মামুদ ২০১৬ : ৪৫)

প্রতাপশালী সৈনিক থেকে মঠবাসী সন্ন্যাসীতে পরিণত হওয়ার প্রথম দিকে সিয়েৰ্গি গির্জা থেকে প্রভূত মানসিক শান্তি ও সাহস প্রাপ্ত হলেও জীবনের এই পর্যায়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেন গির্জার মূল পরিচালক বা ফাদার সুপিরিয়রদের এক নতুন রূপ। সিয়েৰ্গি যতই বাহ্যিক লোভ-লালসা কাটিয়ে ক্রমশ নিজেকে সন্ত পর্যায়ে উন্নীত করছেন, ততই ফাদার সুপিরিয়ররা তার এই নতুন খ্যাতি আর তার প্রতি দর্শনার্থীদের অদম্য আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে খুলে বসেন নতুন ব্যবসা। এক্ষত্রে অবশ্য ফাদার সিয়েৰ্গি একটা সময় নিজের খ্যাতি উপভোগ করলেও প্রায়শই আত্মদ্বন্দ্বে দগ্ধ হতে থাকেন। তাঁর ভাবনায় সবসময় ঘুরপাক খেত : 'আমি যা করছি তার কতটুকুই-বা ঈশ্বরের সাধনায়, আর কতটুকুই-বা মানুষের জন্যে? ...তিনি অনুভব করতেন যে, তার ঈশ্বর-সাধনার স্থান দখল করে নিয়ে শয়তান এনে দিয়েছে মানুষের জন্যে পার্থিব যত কাজ।' (হায়াৎ মামুদ ২০১৬ : ৪৬)

যে মুহূর্তে তিনি আত্মানুশোচনা দগ্ধ ও পীড়িত সেই মুহূর্তে তাঁকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে যায় ধর্মের বেসাতি, চটকদার বাণিজ্য। মূলত, সিয়েৰ্গির প্রভাবে শহরের বিখ্যাত সুন্দরী মাকোভাকিনার কাম থেকে শুদ্ধতার পথে যাত্রার চমকপ্রদ ঘটনা ফাদার সিয়েৰ্গিকে এনে দেয় প্রভূত খ্যাতি। এরপর সিয়েৰ্গির সান্নিধ্যে একটি মৃতপ্রায় বালকের সুস্থ হয়ে ওঠার কাকতালীয় ঘটনা তাঁর সুখ্যাতিকে করে তোলে গগনস্পর্শী। ফলত 'দর্শকদের আসা যাওয়া বেড়ে যাচ্ছিল ক্রমেই। তার গুহার কাছে আস্তানা গাড়লো সাধু সন্ন্যাসীর দল এবং একটি গির্জা ও অতিথিশালা গড়ে উঠলো। ফাদার সিয়েৰ্গির সুখ্যাতি বরাবরের মতোই, মাত্রাতিরিক্তভাবে কীর্তিত হতে লাগলো, ছড়িয়ে পড়তে লাগলো দূর হতে আরো দূরে। দূরান্ত থেকে আগত দর্শনাথীর ভিড় বেড়ে

গেল, রোগ সারাতে পারেন ভেবে নিয়ে রোগী আনতে লাগল তাঁর কাছে।' (হায়াৎ মামুদ ২০১৬ : ৪৩)

ফাদারের এই সুবিস্তৃত খ্যাতিই কদর্যভাবে ব্যবহার করলেন গির্জার ফাদার সুপিরিয়র। ফাদার সিয়ের্গি নিজেই একসময় অনুধাবন করলেন :

> বর্তমানে যে পরিস্থিতির মধ্যে তিনি আসীন, স্বেচ্ছায় ততখানি নয় যতটা-না মঠের মোহন্ত এবং ফাদার সুপিরিয়রের ইচ্ছাক্রমে, ...তিনি দেখতে পেলেন যে, মঠে দর্শনার্থী আকর্ষণ করা এবং মঠের আয় বাড়ানোর তিনি একটি উপায় মাত্র। আর সেজন্যে মঠ কর্তৃপক্ষ এমনসব কাণ্ডকারখানার মধ্যে টেনে নিয়ে গেল তাঁকে যাতে তিনি আরো বেশি করে তাদের উপকারে আসেন। যেমন ধরা যাক, তাঁর জন্যে কায়িক পরিশ্রমের সম্ভাবনা আর ছিল না। যা কিছু তাঁর দরকার পড়তে পারে তা তার জন্যে বরাদ্দ করা হলো, এবং পরিবর্তে শুধু একটিই দাবিই করা হলো তাঁর কাছে: দর্শনার্থী যারা আসে তাদের যেন তিনি দর্শন দেন, আশীর্বাদ করেন। তাঁর সুবিধার জন্যে দেখা করার নির্দিষ্ট সময় স্থির করে দেওয়া হলো। প্রস্তুত হলো পুরুষদের জন্যে ওয়েটিঙরুম এবং রেলিং-দেওয়া একটা জায়গা, যাতে করে তার পদপ্রান্তে হত্যে-দিয়ে-পড়া শরণাগত মহিলাদের চাপে তিনি পড়ে না যান, যেখান থেকে তিনি তাঁর আশীর্বাণী সিঞ্চন করবেন তাদের ওপর। (হায়াৎ মামুদ ২০১৬ : ৪৫)

বস্তুত, মঠের কর্তাব্যক্তিদের এই আদেশ-অনুরোধ ফাদার সিয়ের্গি মেনে চলতে বাধ্য হতেন। কেননা তারা সিয়ের্গিকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, 'লোকজনের দরকার তাঁকে; যিশু নির্দেশিত প্রেমধর্মের কথা মনে রেখে জনগণের তাঁকে দশর্নলাভের দাবি তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না, তাদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া নিষ্ঠুরতা হবে', তাই তিনি অনায়াসেই রাজি হয়ে যেতেন।

ফাদার সিয়ের্গির চোখে সমকালীন গির্জার অধিকর্তাদের আর একটি কদর্য রূপ ধরা পড়েছিল ঘটনাচক্রে। যদিও গির্জার সেবকদের সমাজের উঁচু-নিচু, জাত-পাত হিসেব করে তদনুসারে আচরণ অসঙ্গত, কেননা তাদের জাগতিক মোহ ত্যাগ করে ঈশ্বরের সাধনায় নিয়োজিত হতে হয়; কিন্তু সিয়ের্গি লক্ষ করেছিলেন স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তে ফাদার সুপিরিয়ররা কেমন তোষামুদে চরিত্র হয়ে ওঠে। এক প্রার্থনা সভায় মঠে আগত এক জেনারেলের সঙ্গে ফাদার সুপিরিয়রের আচরণ উল্লেখ্য :

> দেয়ালের কাছে ফাদার সুপিরিয়র দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর ছোট ছোট মেদল হাত ভুঁড়ির ওপরে রাখা, তাঁর পোশাকের স্বর্ণখচিত সূচিকর্মের ওপরে আঙুল নাচাতে নাচাতে হেসে হেসে কথা বলছিলেন সৈনাধ্যক্ষের পোশাক পরিহিত ভদ্রলোকটির সঙ্গে। ...তাঁর টেকো মাথাসহ চর্বিভরা লালমুখে আনন্দ ফুটে বেরুচ্ছিল। (হায়াৎ মামুদ ২০১৬ : ২৫)

এই ফাদার সুপিরিয়রের সঙ্গে সাযুজ্য রয়েছে *অহিংসা* উপন্যাসের বিপিন চরিত্রের। বিপিনও স্বার্থসিদ্ধির কারণে আশ্রমের ভূমি দানকারী মহীগরের রাজপুত্র নারাণের তোষামোদে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকে; এমনকি তার অনৈতিক কাজে সহায়তা করতেও দ্বিধা করে না। বন্ধু সদানন্দের খ্যাতি, জনপ্রিয়তা এবং বাক-পটুতাকে আশ্রয় করে সেও ফেঁদে বসে আশ্রম ব্যবসা।

তিন

অহিংসা উপন্যাসটির আখ্যান নির্মিত হয়েছে রাধাই নদী তীরবর্তী সদানন্দ সাধুজীর শতবিঘার আশ্রমকে ঘিরে। উপন্যাসের সূচনাই ঘটেছে নবযৌবনা স্রোতস্বিনী রাধাই নদীর তীরে সদানন্দ সাধুজী কর্তৃক দর্শনকামী শ্রোতাদের উদ্দেশে প্রেম ও অহিংসার বাণী প্রচারের মাধ্যমে। আর উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটেছে উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র মহেশ চৌধুরীকে আশ্রয় করে – স্বীয় পুত্র হন্তারকের প্রতি এই প্রেম ও অহিংসার বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে। আশ্রমিক ব্যবসার কাহিনি নিয়ে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অহিংসা* উপন্যাসটি প্রকাশের পর থেকেই এটির নামকরণ নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। কেননা তৎকালে ভারতবর্ষে গান্ধিজির ব্রিটিশবিরোধী অহিংস আন্দোলন ছিলো উত্তুঙ্গ পর্যায়ে। তাই বাম ঘরানার লেখক হিসেবে পরিচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নামকরণ এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে গান্ধীবিরোধী প্রতীকী কিছু খুঁজতে অনেকেই ছিলেন সচেষ্ট। এমনকি মানিকের জীবনীকার ও সাহিত্য-সমালোচক সরোজমোহন মিত্রও একে বিতর্কিত উপন্যাস বলে মন্তব্য করেছেন :

> *অহিংসা* (১৯৪১) মানিকের একটি বিতর্কিত উপন্যাস। বিতর্ক কেবল নামকরণে নয়, এর প্রকৃতি বিচারেও সমালোচনায় নানা বিতর্ক আছে। (সরোজ মোহন ২০০৯ : ২৭৬)

আবার সমলোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *অহিংসা*কে বলেছেন দুর্ভেদ্য ও দুরূহতম উপন্যাস। তাঁর মতে :

> *অহিংসা* ও *অমৃতস্য পুত্রাঃ* গ্রন্থখানি অবিমিশ্র অসাফল্যের উদাহরণ। প্রথমটিতে আশ্রমের ইতিহাসটি ভণ্ডামি, ধর্মান্ধতা, এবং কখনও গোপন, কখনও প্রকাশ্য যৌনলালসার উদ্ভট লীলাক্ষেত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই দুর্বোধ্য আখ্যানে লেখকের কোন স্থির লক্ষ্য বা স্পষ্ট উদ্দেশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। মাঝে মধ্যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণচেষ্টা ও গ্রন্থকারের নিজের জবানীতে উক্তি গ্রন্থের ঘোরালো আবহাওয়াকে আরও দুর্ভেদ্য করিয়াছে। মহেশ চৌধুরী, সদানন্দ, বিপিন, মাধবী, বিভূতি প্রভৃতি কোন চরিত্রই ঠিক বোধগম্যতার স্তরে পৌঁছায় নাই; ইহারা যেন অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে পরস্পরের সহিত ঠেলাঠেলি- সংঘর্ষ বাঁধাইয়া ও ক্ষণস্থায়ী, মূল্যহীন সম্বন্ধে জড়িত হইয়া এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। (শ্রীকুমার ২০০৭ : ৫১৯)

এতসব সমালোচনার মুখে পড়ে অবশেষে মানিক তার *অহিংসা*-পরবর্তী উপন্যাস *প্রতিবিম্বের* (১৯৪২) মুখবন্ধে *অহিংসার* বিতর্ক প্রসঙ্গে একটি ভূমিকা লিখতে বাধ্য হন। প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হল :

> আমার *অহিংসা* বইখানি নিয়ে এরকম অভিযোগ উঠেছিলো। দেশে অহিংস নীতিতে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। বইখানার নাম *অহিংসা*। সুতরাং যদিও বইখানাতে রাজনৈতিক কোন ব্যাপার নেই, তবু ধরে নিতে হবে অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে কাহিনির সংস্রব আছে। সোজাসুজি যোগসূত্র খুঁজে না পাওয়া যাক, কাহিনীকে সিম্বলিক ধরে নিয়ে –
>
> কি বলতে চাচ্ছেন ঠিক ধরতে পারছি না মানিকবাবু।
>
> যা বলিনি তা ধরতে চাইছেন কেন?
>
> প্রশ্নকারী তিন ঘণ্টা ধরে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন আমার লেখা বইয়ে আমি কি বলেছি আর কি বলিনি! নীতি বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করেও সাধারণ মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই অনেক অহিংস কাজ করে, হিংসার সঙ্গে অহিংসাও যে মানুষের মধ্যে থাকে এবং এই সাধারণ অহিংসাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ নিয়ে যে উপন্যাস লেখা যায়, এটা তাঁকে কোনমতেই বুঝিয়ে দিতে পারলাম না। (সরোজ মোহন ২০০৯ : ২৭৮)

বস্তুত, *অহিংসা* উপন্যাসটি দুই বন্ধু বিপিন এবং সদানন্দের আশ্রমিক ব্যবসার কাহিনি-চিত্র। ধর্মের ছদ্মাবরণে অবদমিত কামনা-বাসনা, স্বার্থবুদ্ধি, অর্থলিপ্সা এবং যৌনবিকৃতির বাস্তব চিত্রের সমান্তরালে এই উপন্যাসে আছে জটিল এবং দুরূহ মনোবিশ্লেষণ। আমাদের সমাজজীবনে ধর্মকে কেন্দ্র করে যে অনাচার এবং ভণ্ডামি সংঘটিত হয় *অহিংসা* উপন্যাসে তার চমৎকার প্রতিফলন ঘটেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ধর্মব্যবসার এই ক্লেদাক্ত-পঙ্কিল দিকটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। প্রকৃতপক্ষে, সমাজের সনাতনধর্মী সাধু সন্ন্যাসীরা স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনের বিপরীত স্রোতে জীবন নির্বাহ করে বলে তাদের জৈবিক বৃত্তিকে অনেক বেশি অবদমিত করে রাখতে হয়। হতে পারে সেজন্য তাদের মনোবিকৃতির পাশাপাশি যৌন বিকৃতি অনেক বেশি। নিরীহ সরল গ্রামীণ জনতার ভক্তিপরায়ণতার এমন নির্মম বাস্তবতা ও ধর্মব্যবসার এমন নিখুঁত চিত্র মানিকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছিল অনুপস্থিত।

অহিংসা উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র বিপিন হচ্ছে সদানন্দের সহযোগী চরিত্র। সদানন্দকে আশ্রয় করে সে-ই মূলত আশ্রম পরিচালনা করে। তাই আড়ালে আবডালে সদানন্দকে সে নাম ধরে ডাকে। এমনকি সাধুরূপী সদানন্দের সঙ্গে ঠাট্টা মশকরা করতে পর্যন্ত ছাড়ে না। তবে লোক ঠকানোর প্রয়োজনে দশজনের সামনে সে-ই আবার শিষ্যত্বের খোলস বজায় রেখে চলে। সদানন্দকে ঘিরে বিপিনের এই

ধর্মব্যবসার ইঙ্গিত আছে উপন্যাসের একাধিক স্থানে। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল :

> সদানন্দ গম্ভীরমুখে বলিল, বড়লোকের পা-চাটা আর টাকা রোজগারের ফন্দি আঁটবার জন্য আশ্রম করেছিলি বিপিন? তা হলে ব্যবসা করলেই হত?
>
> বিপিন তর্ক করিল না, হাতজোড় করিয়া হাসিয়া বলিল, এ ব্যবসা মন্দ কি প্রভু? (হায়াৎ মামুদ ২০০৮ : ৪০৮)

স্বার্থান্ধ বিপিনের যখন সাধু সদানন্দের সঙ্গে মতান্তর ঘটে মাধবীকে ঘিরে, তখন সে জনগণের কাছে ক্রমান্বয়ে ধ্যানীর আসন পাওয়া সদানন্দের ভক্ত মহেশচৌধুরীকে ঘিরে নতুনভাবে আশ্রম ব্যবসার ফন্দি আঁটে। তার ব্যাবসায়িক এই স্বার্থবুদ্ধি উল্লেখ্য :

> তিনদিনের পথ হাঁটাইয়া অনেক দূরের গ্রাম হইতে মানুষকে যদি আশ্রমে টানিয়া আনিতে হয় আর একদিনের প্রণামীর পরিমাণ দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে দেশের সর্বত্র আশ্রমের শাখা খুলিবার ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া দেওয়া সম্ভব করিতে হয়, তাহা হইলে অন্যকিছু করা চাই, কেবল সদানন্দকে দিয়া কাজ চলিবে না। মহেশ চৌধুরীকে এরা পছন্দ করে– এইসব সাধারণ মানুষগুলি। (হায়াৎ মামুদ ২০০৮ : ৪৪৪)

কেবল বিপিন নয়, সাধুরূপী সদানন্দ নিজেও নানান কৌশলে জনগণের ঈশ্বরভক্তি আর ধর্মীয় দুর্বলতাকে পুঁজি করে লোক ঠকিয়েছে নিখুঁত পারঙ্গমতায়। তার দর্শনেচ্ছায় আগত ভক্তকুলের সঙ্গে আচরণে এই ভণ্ডামির চিত্র সহজেই অনুমেয় :

> প্রণামী দিতে গিয়া দু একজন পায়ে আছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সুবিধা হইল না। প্রথম জনকে সদানন্দ বলিল, উঠে বোসো। তিনদিন মাছ, মাংস, মেয়ে মানুষ ছুঁয়ো না। এবার যাও। দ্বিতীয় জনকে সংক্ষেপে বলিল, পাঁচ বছরের মধ্যে তুমি আমার কাছে এস না। ...নতুন লোকও আসিয়াছিল অনেক। কিন্তু পায়ে আছড়াইয়া পড়ার (তিন টাকা প্রণামী দেওয়ার পরও) আর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করার (প্রণামী আড়াই টাকা) ফল দেখিয়া সকলের সাহস গেল। (হায়াৎ মামুদ ২০০৮ : ৪৮৩)

মূলত, পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কায় মানুষের চিরায়ত অনেক ধর্মবিশ্বাস এবং ধ্যানধারণা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। পুরনো মূল্যবোধ, সংস্কার সবই বিপর্যস্ত হয়ে সেখানে দেখা দেয় শুধু লোভ, মুনাফা আর নারীমেধযজ্ঞ। আলোচ্য উপন্যাসের পরতে পরতে সমাজের সেই ভাঙনের চিত্র রূপায়িত হয়েছে নিরেট বাস্তবতায়। 'সবমিলিয়ে *অহিংসা* উপন্যাসটি মানিকের একটি উল্লেখ্যযোগ্য সৃষ্টি। এই কাহিনির মধ্যে আছে মানিকের দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিচয়, ধর্মের নামে ব্যবসায়ের কথা।' (সরোজ মোহন ২০০৯ : ২৭৯)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আশ্রম ও সাধুজীবনকে ঘিরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে *তেইশ বছর আগে ও পরে* (১৯৫৩) নামে আর একটি উপনাস রচনা করেছিলেন। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত এক যুবকের সন্ন্যাস নিয়ে আশ্রমবাস ও হৃদয়ের ক্ষত উপশমের আপাত সমাধান হিসেবে সাধুগিরি করার কাহিনিই মূলত সে উপন্যাসের প্রধান প্লট। কিন্তু তার মধ্যেও লেখক অপূর্ব নান্দনিক সংযমে গ্রামে-গঞ্জে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গজিয়ে ওঠা আশ্রম ও তার কর্ণধার ভণ্ড সাধুদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। 'তবে *অহিংসার* মত হিংস্র নিষ্করুণ অব্যাখ্যেয় কাহিনী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্ভবত আর একটিও নেই।' (হায়াৎ মামুদ ২০০৮ : ভূমিকাংশ) এই উপন্যাসটি তাই হয়ে উঠেছে ধর্মব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচনের বাস্তব ইতিবৃত্ত।

চার

অহিংসা উপন্যাসের পরতে পরতে যেমন মিশে আছে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব; তেমনি *লালসালু* উপন্যাসের মর্মমূলে প্রোথিত রয়েছে বিশ শতকের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক তত্ত্ব– অস্তিত্ববাদ। কেননা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সমকালীন জোয়ারস্রোতে আয়েশে গা ভাসাননি; বরং তৎকালীন প্যান-ইসলামি পাকিস্তানি সমাজে মাজার ব্যবসার বিপরীতে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী ও সাহসিক উপস্থাপনা ঔপন্যাসিকজগতে ওয়ালীউল্লাহকে বিশিষ্টতা প্রদান করেছে নিঃসন্দেহে। আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাববস্তু তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের একেবারেই অনুকূল ছিল না। কেননা, তখনো সদ্য আলোর মুখ দেখা পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমান সমাজ ধর্মীয় উন্মাদনার নেশাগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পায়নি। ফলে সে সময়কার সাধারণ পাঠকের কাছে স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত ধর্মাচারের বিপরীতে রচিত উপন্যাসটি যথার্থ আদৃত হয়নি। যদিও 'ধর্ম নিয়ে সজ্ঞানে বেসাতি করার কাহিনী নিয়ে ইতিপূর্বেও সাহিত্য রচিত হয়েছে। কিন্তু কাহিনী পরিবেশনের ব্যতিক্রমী ভঙ্গীর কারণে এটি পাঠকের প্রত্যাশাকে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়।' (সৌদা আখতার ২০০১ : ১২)

লালসালু উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মজিদ দারিদ্রপীড়িত এমন এক অঞ্চলের অধিবাসী; যেখানে দারিদ্র্য আর ধর্ম সমার্থক শব্দ। তাই 'দু-বেলা খেয়ে বাঁচার জন্যে অর্থাৎ মজিদ অস্তিত্বরক্ষার জন্যে, বেঁচে থাকার প্রশ্নে আত্মনির্মিত। সে তার উন্মূলিত অস্তিত্ব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন; এবং এর-ই বিপরীত ক্রিয়ায় মজিদ স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছায় নির্বাচন করেছে মাজার-ব্যবসা।' (সৈয়দ আকরম হোসেন ২০১০ : ৮৩) গ্রামের অতি পুরাতন এক কবরকে সে বিনির্মাণ করেছে মোদাচ্ছের পীরের মাজার হিসেবে; এবং ধীরে ধীরে এই মাজারকে ঘিরেই তার শেকড় গভীর থেকে গভীরে প্রোথিত হয়েছে। সর্বোপরি ধর্মকে ব্যবহার করে সে হয়ে উঠেছে গ্রামের নীতি নির্ধারক, মূর্তিমান আতঙ্ক।

মজিদের নিজের কর্ম-সাধনার ওপর প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল; আর ছিল হতদরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবনাভ্যাস ও চরিত্র সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি। নিজের জীবনের পূর্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে সে জানে গ্রামের দারিদ্র্যপীড়িত শ্রমজীবী গ্রামবাসী ইহলৌকিক দুঃখ-দুর্দশা, আবেগ-আনন্দের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত থাকে যে, তারা চায় তাদের হয়ে আর কেউ তাদের ধর্মীয় অনুশাসনের কাজগুলো করে দিক। ধর্মের অন্তর্গত দর্শন নয় বরং তার আনুষ্ঠানিক আচারের প্রতিই তাদের আকর্ষণ বেশি। বস্তুত, এদের অন্ধ, অযৌক্তিক, অপ্রতিরোধ্য ধর্মানুরাগ আর লোকাচার-মনোবৃত্তিই ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রতারণার পরিবেশ তৈরি করে দেয়। 'গ্রামবাসী ধর্মীয় আচার মানে যেন অভ্যাস ও আজন্ম সংস্কারের ফলেই। এরা বিশ্বাসপ্রবণ। পিতৃপুরুষেরা ধর্ম মেনেছে। ধর্মের অবশ্য করণীয় শর্তগুলো পালন করেছে; সুতরাং অভ্যাসবশতই তারা প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মের মতই ধর্মীয় আচরণগুলো অনুকরণ করে।' (সৌদা আখতার ২০০১ : ১৫)

মজিদ কেন মজিদ হয়ে উঠলো, কেন তাকে মিথ্যের আশ্রয়ে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে নিয়ে কপট খেলায় মেতে উঠতে হলো তার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে লেখক উপন্যাসের প্রারম্ভেই একটি ধারণা দিয়েছেন প্রাসঙ্গিকভাবে। সীমাহীন খাদ্যের অভাব, দারিদ্র্য, অথচ জনবহুল এই এলাকার লোকেদের এলাকা ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ার প্রবণতা এবং কার্যকারণ লেখক বর্ণনা করেছেন নিখুঁত বাস্তবতায়। প্রাসঙ্গিক এলাকা উল্লেখ করা যেতে পারে :

> শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থান বিশেষ খুনাখুনি করে সর্ব প্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে – প্রদেশের; হয়তো-বা আরো দূরে।' (কাদির ২০০৩ : ৯)

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মজিদও একই ধারাবাহিকতায় জীবিকার তাগিদে নিজের ধর্মবুদ্ধিকে পুঁজি করে গারো পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে একটি মসজিদে ইমামতি করে অন্নসংস্থানে উদ্যোগী হয়। কিন্তু সেখানকার পাহাড়ি সমাজকাঠামোয় সে হয়ে পড়ে আগন্তুক, অপরিচিত অতিথি। তাই এই সীমাহীন নির্জনতায় আত্ম-নিঃসঙ্গতায় ভেতরে ভেতরে সে লালন করে মূল স্রোতে স্বাভাবিক জীবন গড়ার স্বপ্ন। আর সেই সুপ্ত স্বপ্ন বাস্তবতার ইঙ্গিত পায় যখন সেই নির্জন পাহাড়ে একজন মূল স্রোতের অধিবাসী বাঙালি সৌখিন শিকারির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। মূলত তারই প্রেক্ষণবিন্দুতে লেখক মজিদের ভেতরকার নির্জনতার হাহাকার উপস্থাপন করেছেন অপূর্ব কুশলতায় : 'আত্মীয় স্বজন ছেড়ে বনবাসে দিন কাটানোর ফলে লোকটির চোখেমুখে নিঃসঙ্গতার বন্যশূন্যতা'। এবং ঐ চরিত্রটির মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি মজিদের ভেতরকার আত্মসম্মানবোধের চূড়া। শিকারির সঙ্গে আলাপচারিতার একটা পর্যায়ে

মজিদ তার গারো পাহাড়ের জীবন নিয়ে আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে করে মিথ্যাচার। যদিও মিথ্যে বলা মজিদের যাপিত ধর্মে মহাপাপ। তবু আত্ম-অহং রক্ষার প্রশ্নে সে বলে না যে, পেটের দায়ে নির্মম দারিদ্র্যের কশাঘাতে সে দেশছাড়া, ঘরছাড়া; বরং গরিমার সঙ্গে সে জানান দেয় :

> এধারের লোকদের মধ্যে খোদাতালার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত কাফের। তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বলে না যে, দেশে শস্য নেই, দেশে নিরন্তন টানাটানি, মরার খরা। (কাদির ২০০৩ : ১১)

মজিদের এই আত্মঅহংবোধই পরবর্তীকালে মহব্বতনগরের মানুষগুলোর ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে প্রতারণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তাকে। যে ধর্মীয় মূল্যবোধকে ব্যবহার করে মজিদের জীবিকা নির্বাহ, অস্তিত্বের প্রয়োজনে, মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে, খ্যাতির মোহে সেই ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অস্বীকার করতেও সে কুণ্ঠিত হয়নি; বরং অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থের প্রয়োজনে ক্রোধের মুহূর্তে মজিদ গ্রামীণ মানুষের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেই নির্মাণ করেছে ধর্মীয় বিধি-বিধান। তীব্র প্রতিশোধপরায়ণ মজিদ গ্রামের মোড়ল খালেক ব্যাপারির স্ত্রীকে ঘরছাড়া করতে তৈরি করেছে ধর্মের আড়ালে নিজস্ব বিধান। আবার মজিদের কোপানলে পড়ে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অশীতিপর বৃদ্ধ তাহের-কাদেরের বাপ বেছে নিয়েছে আত্মহননের পথ। অন্যদিকে, 'যেহেতু মজিদের সকল ক্ষমতার শেকড় প্রোথিত ধর্মব্যবসার মাটিতে তাই কখনো কখনো এক ধরনের ভীতি দ্বারা সে তাড়িত হয়। এই ভীতিই তাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। তার প্রতি লোকায়ত মানুষের সামান্যতম অবহেলাও তার চোখে পড়ে।' (সৈয়দ আকরম, ২০১০ : ৮২)

মাজারের প্রতি দুর্বলতা বাঙালি মুসলমান সমাজে ধনী-গরিব, শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে প্রায় সব অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কমবেশি প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই, 'যে সমাজে মানুষ নিজেদেরকে এক অদৃশ্যশক্তির হাতে সমর্পণ করে পরোক্ষ অনুভূতি ও যুক্তিহীন অন্ধ আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়, সে সমাজে ধর্মব্যবসায়ীদের সাধারণ মানুষকে যথেচ্ছ প্রতারণা করার যথেষ্ট সুযোগ বিদ্যমান।' (আবুল মকসুদ ১৯৮১ : ৯৪) ধূর্ত মজিদ তীব্র পর্যবেক্ষণশক্তির বলে সহজেই আন্দাজ করে নেয় যে, গ্রামের বাইরে বাঁশঝাড়ের অভ্যন্তরে প্রাচীন, পরিত্যক্ত কবরটির ঠিকুজি, কুলজি সম্পর্কে গ্রামের লোক অজ্ঞাত। অশীতিপর বৃদ্ধ সলেমনের বাপ থেকে শুরু করে মাতব্বর রেহান আলী, মোড়ল খালেক ব্যাপারী, যুবক কালু মতি পর্যন্ত এই কবরটির মূল ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই মজিদ নিশ্চিন্তেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এই ভয়ানক কবর ব্যবসায় লিপ্ত হয়।

অস্তিত্বরক্ষার প্রাথমিক ধাপে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত মজিদ মানসিক জৈবিক চাহিদা পূরণের নিমিত্তে স্ত্রী হিসেবে ঘরে আনে স্থূলদেহী শান্তভাষী, বিধবা রহীমাকে। রহীমার চোখে

ঘনায়মান ভয় আর মাজারের প্রতি ভক্তির প্রকাশ দেখে মজিদ সমগ্র গ্রামবাসীর আনত আনুগত্যবোধ অনুমান করতে পারে। ফলত, রহীমার প্রতি সে আরও বেশি করে আরোপ করে নিত্য-নতুন বিধি নিষেধ। একের পর এক ফতোয়া দিয়ে যেন পরীক্ষা করে নিতে চায় রহীমার অন্ধ বিশ্বাসের গাঢ়ত্বকে : 'অমনি করি হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে। ...অমন করি কখনো হাঁটিও না। কবরে আজাব হইবে। ...খোলা জায়গায় অমন বে-শরমের মতো দাঁড়াইও না বিবি।' ফলস্বরূপ, রহিমার নির্বাধ বাধ্যতা প্রত্যক্ষ করে মজিদ নির্ভার হয় তার শেকড়বিহীন বৃক্ষের অস্তিত্ব সম্পর্কে।

ক্রমশ মজিদের ধনবৃদ্ধির সঙ্গে মর্যাদার উন্নয়ন ঘটে। সাধারণ গ্রামবাসীর সমান্তরালে গ্রামের নীতিনির্ধারক মহলেও তার গুরুত্ব বেড়ে যায়। মজিদও তার এই সদ্যপ্রাপ্ত মর্যাদার আসনটি ধরে রাখতে বিশেষত, মাজারকে ঘিরে ভৌতিকতা-অলৌকিকতা ধরে রাখতে ধর্মকে পুঁজি করে নানান ক্রিয়াকর্মের আশ্রয় নেয়। যেমন, গ্রামের সাধারণ জনতাকে এমনকি মাতব্বর শ্রেণির লোকদের পর্যন্ত তাদের ধর্মীয় অজ্ঞতা সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করে, কটাক্ষ করে মজিদ সুকৌশলে তাদের সারাক্ষণ বিব্রত করে রাখে। কারো কালেমা না জানার দুর্বলতা নিয়ে যেমন পরিহাস করতে ছাড়ে না, তেমনি বাপ-ছেলেকে সর্বসম্মুখে একই মঞ্চে খৎনা দিয়ে মূলত গ্রামবাসীর ওপর তার প্রভাবের বিষয়টি আরও একবার ঝালাই করে নেয়। প্রকৃতপক্ষে, 'যুগ যুগ ধরে এ নরোম পলি মাটি বিধৌত ধর্মভীরু মানুষের মনটিও নরোম; ফলে এ মাটির শাসক-শোষক শ্রেণীর অন্যতম হলো ধর্ম-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, তাদের কাছে মানুষের দুর্বলতাই বড় পুঁজি। বস্তুত, 'আত্মপ্রতিষ্ঠা, মানবীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মজিদ ধর্মের আর্কে-টাইপকে গ্রহণ করেছে।' (জীনাত ইমতিয়াজ ২০০৬ : ৯৬)

মাজারকে ঘিরে যারা ব্যবসা করে তারা মূলত সত্য-মিথ্যায় নিজের চারপাশে দুর্ভেদ্য একধরনের রহস্যাবরণসহ অলৌকিক-অতিলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখে। তাদের প্রধান অবলম্বন হয় লোকের অজ্ঞতা, সর্বোপরি অশিক্ষা-কুশিক্ষা, আচারসর্বস্ব ধর্মে বিশ্বাস। 'বাঙালী মুসলমান সমাজে যতো রকম শোষক, নিপীড়ক, প্রতারক ও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণি আছে তাদের একটির প্রতিনিধি মজিদ। ধর্মের নামে সমাজের কল্যাণকামীর লেবাসে সমাজের দুশমন যে শ্রেণিটি, মজিদ তার অন্তর্গত। সমাজে সে প্রভুত্বের জাল বিস্তার করেছে অন্যায়, মিথ্যাচার ও শঠতার মাধ্যমে; এবং সেটা করা সম্ভব হয়েছে সমাজের মানুষের অশিক্ষা, কুসংস্কার, সারল্য ও অন্ধ-বিশ্বাসের সুযোগে। এ জন্যে মানুষের মধ্যে অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাস জীইয়ে রাখার জন্যে তার আপ্রাণ চেষ্টা। সমাজকে সে সামনে এগোতে না দিতে বদ্ধ পরিকর। কারণ সমাজের পশ্চাৎমুখিতাই তার পুঁজি।' (আবুল মকসুদ ১৯৮১ : ১০৯) আর এ

কারণেই কিঞ্চিৎ শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত গ্রামীণ যুবক আক্কাস যখন গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে, মজিদ তখন স্বীয় অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তবে সুচতুর মজিদ গ্রামবাসীর সম্মুখে আক্কাসকে সরাসরি আক্রমণ না করে গ্রহণ করে অন্যকৌশল। আক্কাসের সৎ ও সময়োপযোগী মহৎ উদ্দেশ্যকে পরাস্ত করতে ধর্মীয় আচারকে ব্যবহার করে সে। তার এই ধূর্ত কৌশলের কারণে গ্রামের ভরা সভায় স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা বড় না হয়ে, বড় হয়ে ওঠে আক্কাসের দাড়ি না থাকার প্রসঙ্গটি। জ্ঞানের আলোর পথ রুদ্ধ হয় ধর্মব্যবসায়ীর কুটিল চালে। প্রকৃতপক্ষে, 'মজিদের মধ্যে আছে ধর্মের আচার, ধর্মের সারাৎসার নয়। মজিদ ধার্মিক নয়, ধর্মব্যবসায়ী। ফলে ধূর্ততা তার সহজাত।' (মান্নান সৈয়দ ১৪০৭ : ৫৫)

উপনাসের সমাপ্তিতে প্রতাপশালী মাজার ব্যবসায়ী মজিদের ক্রম পরাজয়ের ইতিহাস রচনা করেছেন লেখক। এই পর্বে মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী কিশোরী জমিলা ক্রমাগত অবাধ্যতার মাধ্যমে এক ধরনের নির্লিপ্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে মুখোশধারী মজিদের বিরুদ্ধে; যা বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, ধূর্ত, সংগ্রামশীল মজিদের ছিল কল্পনার বাইরে। জমিলার অবাধ্যতায় ভীত মজিদ জমিলার অনিয়মিত নামাজ না-পড়া নিয়ে, তার রূপচর্চা নিয়ে জমিলাকে শাসন করে; জমিলা প্রচলিত পর্দাপ্রথার সীমানা অতিক্রম করে বাইরে এলে স্বীয় আত্মসম্মান ও নিজের কৃতিত্ব রক্ষার্থে উপস্থিত ভক্তকুলের কাছে তাকে পাগলি ঝি বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ ও হতাশায় নিমজ্জিত মজিদ একটা পর্যায়ে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিকারের শেষ চেষ্টা হিসেবে জমিলাকে জোর করে তুলে নিয়ে মাজারের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। প্রতিবাদে নিরুপায় জমিলা তাঁর মুখে থুথু দেয়; তবু মজিদ তার নিষ্ঠুর সংকল্পে অটল থাকে। অবশেষে জমিলা এই ধর্মব্যবসায়ীকে চরম আঘাত হানে মজিদ-সৃষ্ট মিথ্যা মাজারের গায়ে তার মেহেদি-রাঙা পায়ে পদাঘাতের মাধ্যমে। জমিলার মেহেদী রাঙা পা মূলত এখানে জমিলার প্রতিবাদের প্রতীক (symbol) হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ 'উপন্যাসের সমাপ্তিতে মানুষ ও প্রকৃতি দুই-ই মজিদের বিরুদ্ধে চলে যায়।... নারী তার বিরুদ্ধে চলে যায়। নিসর্গ তার বিরুদ্ধে চলে যায়। খাঁ খাঁ প্রান্তরে গ্রামবাসীর হাহাকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে মজিদ বুক বাঁধে ফের। বোঝা যায়, তার সংগ্রাম শেষ হয়নি আজো, তার বেঁচে থাকার সংগ্রামশীলতা চলবেই।' (মান্নান সৈয়দ ১৪০৭ : ৫৪)

মজিদ যে ভাবে এক মিথ্যা ধর্মবোধের আশ্রয়ে মহব্বতনগর গ্রামের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে, ঠিক তেমনি ৪৭-এর দেশবিভাগের পর এক শ্রেণির ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও ধর্মব্যবসায়ী এ সমাজের ওপর চেপে বসেছিলো। এমনকি ১৯৭১ সালে, অসাম্প্রদায়িকতার মূলমন্ত্র নিয়ে গঠিত বাংলাদেশেও তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাঙালি সমাজের এই অতি পুরাতন, গভীর অসুখটিকে নিপুণ কারুকার্যে উপস্থাপন করেছেন। সমালোচকগণ তাই যথার্থই বলেছেন : 'লালসালু সম্ভবত গ্রাম্য সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ– দুর্মর কুসংস্কার ও ধর্ম-ব্যবসার

মর্মান্তিক প্রকৃতি নিরূপণে প্রথম আধুনিক প্রচেষ্টা।'(হাসান আজিজুল হক ১৯৮১ : ২১)

পাঁচ

আলোচ্য ত্রয়ী উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্রেরই পতন ঘটেছে নারীকে ঘিরে। মজিদের আত্মপতনের সূচনা ঘটে অল্পবয়সী মিষ্টি মেয়ে জমিলার মাধ্যমে। 'মজিদের কাম যেমন তীব্র, তেমনি ক্রোধও প্রতিশোধাত্মক। দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলাকে মাজারের মধ্যে খুঁটিতে বেঁধে তাকে বশীভূত করার চেষ্টার মধ্যেও রয়েছে তার প্রবল প্রতাপ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও ক্রোধ। মজিদকে কামুক ও ক্রোধী হিসেবে অংকন করে লেখক তাকে বস্তুত মাটির পৃথিবীর মানুষ করেই এঁকেছেন।' (মান্নান সৈয়দ ১৪০৭ : ৫৪) যৌনতাকে, অন্তস্থ লিবিডো চেতনাকে মজিদ মূলত ধর্মের আবরণে ব্যবহার করেছে। *লালসালু* উপন্যাসে মজিদের যৌন-মনস্তত্ত্ব রূপায়ণে লেখক প্রধানত সেমিটিক মিথের প্রয়োগ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় মজিদ প্রসঙ্গে বার বার সর্প প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে।

অহিংসা উপন্যাসে সাধু সদানন্দের প্রাত্যহিক জীবনধারায় বিচ্যুতি আনে অল্পবয়েসী মেয়ে মাধবী। অন্যদিকে ফাদার সিয়েৰ্গির সন্ন্যাস গ্রহণে যেমন ভূমিকা রেখেছে তার বাগদত্তা মনমোহিনী করৎকোভা, তেমনি সন্ন্যাস জীবনে ব্রতী থাকা অবস্থায় তাকে কামজ পতনে উদ্বুদ্ধ করেছে মানসিক রোগে আক্রান্ত ভক্ত-কন্যা মারিয়া। ফাদার সিয়েৰ্গি এবং সদানন্দের জীবনের অন্যতম মিল হলো এরা সরাসরি ধর্মীয় গুরু হওয়ার কারণে মজিদের মতো বৈবাহিকসূত্রে, সমাজ-স্বীকৃত পন্থায় নারী সংসর্গ লাভ করতে পারেনি। ফলত, তাদের কামজ বাসনা পরিতৃপ্তি লাভ করেছে গোপনে, অবৈধ উপায়ে এবং তা স্বাভাবিকও বটে। বিশ শতকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যতত্ত্ব মনঃসমীক্ষাবাদী সাহিত্যতত্ত্বের প্রবর্তক সিগমুন্ড ফ্রয়েড বলেছেন 'মানুষের দুটি ধর্ম– আনন্দধর্ম এবং বাস্তবধর্ম। মানুষ আনন্দধর্ম দ্বারা তার কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তিকে বোঝায়। অন্যদিকে বাস্তবধর্ম তার বাস্তববুদ্ধির ফসল– সে জানে তার সকল কামনা বাসনা পূর্ণ হবার নয়। তার কারণ বিবিধ; যেমন, সামাজিক বিধি-নিষেধ, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি। আমরা আমাদের আনন্দ উপভোগকে বিশাল মাত্রায় জলাঞ্জলি দিতে রাজি হয়ে যাই... এর নাম অবদমন বা repression।' (আশরাফ ২০১৪ : ১১৫) ফ্রয়েড আমাদের মনের তিনটি অবস্থার কথা বলেন। এগুলো হলো – ইদম (id), ইগো (ego), সুপার ইগো (super ego)। বাংলা ভাষান্তরে যথাক্রমে অবচেতন, অর্ধচেতন ও সচেতন মন। আমরা আমাদের অপূর্ণ বাসনাগুলোকে এই ইদম বা অবচেতন (unconscious) স্তরে পাঠাই। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এগুলোই আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়। সাধু সদানন্দ, মঠবাসী সিয়েৰ্গি ও কবর ব্যবসায়ী মজিদের ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা

ঘটেছে। তাদের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের অবদমিত কামনার স্ফূরণ। মারিয়া, মাধবী ও জমিলাকে ঘিরে এই পতন দ্রুত বাস্তবায়িত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। সদানন্দের সহযোগী চরিত্র আশ্রম-ব্যবসায়ী বিপিনও তীব্র ভোগলালসায় মাধবীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে এই অবদমিত বাসনাবৃত্তির কারণে। আর একারণেই প্রতিযোগী সদানন্দকে টিপ্পনী কাটতে পর্যন্ত ছাড়ে না সে : 'কেন মিছে বালির ঘর বাঁধছ বাবা! রাজপুত্তুরকে ছেড়ে তোমার দিকে ঝুঁকবে, তেমন মেয়েই ও নয়। গুরু সেজে বড়জোর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে গালটা টিপে দিতে পার, তার বেশি কিছু নয়।' (হায়াৎ মামুদ ২০০৮ : ৪১৪)

অপরদিকে, শক্তিশালী পুরুষতন্ত্রের হীন মানসিকতার বিপক্ষে দ্রোহে, প্রতিবাদে সিয়েৰ্গির বাগদত্তা করৎকোভা তুলনামূলক ভাবে ম্লান হলেও, এক্ষেত্রে মাধবী ও জমিলা অনন্য চরিত্র। মজিদ যেমন প্রথম থেকেই জমিলার মনে শ্রদ্ধা জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি যে সদানন্দকে শিষ্যরা দেবতার মত মান্য করে, যমের মতো ভয় করে, তাকে প্রথম থেকেই মাধবী অবজ্ঞা করে এসেছে। সদানন্দের প্রশ্নের মুখে ঝাঁঝালো কণ্ঠে সে উচ্চারণ করেছে : 'তুমি সাধুজী, না? ...আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি তোমার কি?' (হায়াৎ মামুদ ২০০৮ : ৪০৫)

অল্পবয়েসী জমিলাকে বিয়ে করে মজিদ তার জীবনে নিয়ে এসেছে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি। কিশোরী জমিলা যাকে একসময় মনে করেছিল *দুলহার বাপ*, নিয়তির পরিহাসে তাকেই মেনে নিতে হয়েছে স্বামী হিসেবে; কিন্তু পুরুষতন্ত্রের বাইরে গিয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করার সাহস অর্জিত না হওয়ায় তার দ্রোহ প্রকাশিত হয়েছে মজিদের গায়ে থুথু ছিটানো আর মাজারে পদাঘাতের মধ্যদিয়ে। অন্যদিকে কৌমার্য হরণকারী ভণ্ড সাধু সদানন্দ যখন মাধবীকে জীবনের ভালোমন্দ সম্পর্কে পরামর্শ দিতে গেছে, তখন মাধবী হয়ে পড়েছে ক্রোধে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য, আত্মহারা :

> শুনিতে শুনিতে মাধবীলতার দুচোখ জ্বলজ্বল করিতে থাকে, মুখ আরক্ত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে সে কখন স্নান করিয়াছে, ভালো করিয়া মোছা হয় নাই বলিয়া চুল এখনো ভেজা। ভেজা চুলের জলপটি থাকা সত্ত্বেও এমন মাথাগরম হইয়া যায় মাধবীলতার যে, প্রথমে সে খাবারের প্লেট আর চায়ের কাপটা সদানন্দকে ছুড়িয়া মারে, তারপর বাঘিনীর মতো ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া সদানন্দের মুখে রক্ত বাহির করিয়া দেয়।।' (হায়াৎ মামুদ ২০০৮ : ৪০৯)

তিনটি উপন্যাসের প্রধান চরিত্রই ক্রোধ, প্রতিশোধপরায়ণতা আর প্রতিহিংসায় জাগ্রত চরিত্ররূপে চিত্রিত হয়েছে :

> *ক. ফাদার সিয়েৰ্গি* : 'তার একমাত্র যা দোষ ছিল তা হলো অন্ধ ক্রোধ ; রেগে গেলে সর্বপ্রকার আত্মসংযম হারিয়ে ফেলত সে, একেবারে বন্য পশুর মতো হয়ে যেত।' (হায়াৎ মামুদ ২০১৬ : ১০)

খ. *অহিংসার* সদানন্দ : 'মাধুকে আমার চাই। ...কি জানিস বিপিন, আগে মেয়েটাকে বড় মায়া করতাম, এখন কি জানি এমন পাজি শয়তান মেয়ে, তলে তলে এমন বজ্জাত। একটা রাত্রির জন্য ওকে শুধু চাই আমি চাই। ব্যস, এরপর চুলোয় যাক, যা খুশি করুক, আমার বয়ে গেল। ওর অহংকারটা ভাঙতে হবে।' (হায়াৎ মামুদ ২০০৮ : ৪৮২)

গ. *লালসালুর* মজিদ : 'মজিদ একসময় ভাবে, ঝালর দেওয়া সালু কাপড়ে আবৃত নকল মাজারটিই এদের উপযুক্ত শিক্ষা, তাদের নিমকহারামির যথার্থ প্রতিদান। ভাবে, একদিন মাথায় খুন চড়ে গেলে সে তাদের বলেই দেবে আসল কথা। বলে দিয়ে হাসবে হা হা করে গগন বিদীর্ণ করে। শুনে যদি তাদের বুক ভেঙে যায় তবেই তৃপ্ত হবে তার রিক্ত মন।' (কাদির ২০০৩ : ৩৯)

ফাদার সিয়েৰ্গি, মজিদ এবং সাধু সদানন্দের মধ্যে আর একটি সাযুজ্য হলো এরা তিনজনেই বাগ্মী। উপযুক্ত শব্দচয়ন আর আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গির সাহায্যে এরা সহজেই মানুষের মন বশীভূত করতে সক্ষম। মিহি আওয়াজ আর গলার সূক্ষ্ম কারুকার্যে একাধারে ফাদার সিয়েৰ্গি, মজিদ যেমন মানুষকে মোহাবিষ্ট করে ফেলে তেমনি সদানন্দের কথা 'মনের মধ্যে কাঁটার মতো বেঁধে, মধুর মতো মাখা হইয়া যায়, মধুপের মতো গুঞ্জন করে, শুনিতে শুনিতে থাকিয়া হয় রোমাঞ্চ।' (হায়াৎ মামুদ ২০০৮ : ৪০১)

তিনটি উপন্যাসের মধ্যেই চিত্রিত হয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্রের আত্মদহন। মজিদ যেমন প্রায়ই আত্মগ্লানিতে ভোগে; তেমনি সদানন্দেরও রয়েছে তীব্র অন্তর্দহন। আত্মানুশোচনায় জর্জরিত সদানন্দ নিজেই নিজের মনকে প্রশ্ন করে : 'মনে তার শান্তি নাই কেন, এত মানুষকে সে শান্তি বিলাইতেছে? এত ক্ষোভ কেন তার, এমন আকস্মিক ক্রোধের সঞ্চার? ...এমন জ্বালাভরা অস্থিরতা তবে সে বোধ করে কেন? ভাবিতে ভাবিতে বাহিরের মায়ার নেশা যেন গাঢ় হইয়া আসে, আশ্রমে ঢুকিতে অনিচ্ছা বাড়িয়া যায়।' (হায়াৎ মামুদ ২০০৮ : ৪০১) আবার ভেতরে ভেতরে সদানন্দ শূন্যতা বোধ করে। তাই তার দরকার হয় একান্ত কোনো কাছের সুহৃদ। যাকে অকপটে মনের কথা কনফেশন করা যায়। তাই সে বেছে নেয় ধীর-স্থির, প্রজ্ঞাবান একনিষ্ঠ ভক্ত মহেশ চৌধুরীকে : 'হঠাৎ মহেশের পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, মহেশ আমায় তুমি রক্ষা কর– বাঁচাও আমায়।' (হায়াৎ মামুদ ২০০৮ : ৪৭৬)

অন্যদিকে ফাদার সিয়েৰ্গিও একটা সময় মর্যাদার শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থানের পাশাপাশি সব থাকা সত্ত্বেও অদ্ভুত শূন্যতায় কনফেশনের নিমিত্তে ছুটে যায় বাল্যসাথী পাশেনকার কাছে; এবং তার কাছে অকপটে উন্মোচন করে স্বীয় মিথ্যের মুখোশ। প্রকাশ করে ফেলে নিজের ভেতরকার ঘনায়মান শূন্যতা :

> পানশেকা, আমি তোমার কাছেই এসেছি। আমায় তাড়িয়ে দিও না। পানশেকা, আমি সাধুসন্ত নই, এমনকি সরল সাধারণ মানুষ পর্যন্ত নই, আমি পাপী, নোংরা, বদমাইশ, পথভ্রষ্ট, অহংকারী এক পাপী, না আরো খারাপ, জানি না পৃথিবীর সকলের চেয়ে খারাপ কিনা, তবে সবচেয়ে খারাপ লোকের চেয়েও খারাপ।.. আমি ব্যভিচারী, আমি খুনি, আমি ঈশ্বরদোষী প্রতারক। (হায়াৎ মামুদ ২০১৬ : ৬৪)

*লালসালু*র মজিদও একটা সময় মিথ্যা আত্মপ্রতিষ্ঠার নিয়ত যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে ভেঙে পড়ে স্ত্রী রহীমার কাছে :

> রাতের ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও কখনো যে পরমাত্মীয়ের মত কথা বলে না রহীমার সঙ্গে, সে-ই নিজের সত্তার কথা, আত্মমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে রহীমাকে বলে: কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে যানি কুলায় না, তোমারে জিগাই, তুমি কও।' (কাদির ২০০৩ : ৮৬)

একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থায় গড়ে ওঠা ধর্মব্যবসার জন্য কেবল ভণ্ড ধর্মগুরুরাই দায়ী নয়, বরং জনগণের কুসংস্কার আঁকড়ে ধরার প্রবণতা, অতিলৌকিকতায় আসক্তি, রোমাঞ্চপ্রিয়তা, সর্বোপরি ধর্মীয় উন্মাদনাও এজন্য সমানভাবে দায়ী। আলোচ্য তিনজন লেখক এই বিষয়টি সমান গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। ফাদার সিয়ের্গিকে ঘিরে মানুষ যেমন এক ধর্মীয় উন্মাদনার তীর্থস্থান বিনির্মাণ করেছে তেমনি মজিদের মাজার ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়েছে লোকের ভাবাবেগের আতিশয্যে প্রদত্ত লাউ-কুমড়া আর ছাগলের বদৌলতে। *অহিংসা* উপন্যাসেও আছে জনতার এমন ভাবাবেগের চিত্র :

> সদানন্দের আশ্রম জয় করিয়া আসিয়া মহেশচৌধুরীও পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছেন। লোকের ভিড়েই মহেশ চৌধুরীর প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল... পরদিন হইতে শশধর সকলকে একটি করিয়া তুলসীপাতা বিতরণ করিয়া দিতে লাগিল – উঠানের মস্ত তুলসীগাছটা দেখিতে দেখিতে দু একদিনের মধ্যে হইয়া গেল প্রায় ন্যাড়া। যারা আসে, তাদের প্রায় সকলেই চাষী – কামার কুমার মজুর শ্রেণীর এবং বেশিরভাগই স্ত্রীলোক – তুলসীপাতা পাইয়াই তারা কৃতার্থ হইয়া যাইতে লাগিল। (হায়াৎ মামুদ ২০০৮ : ৪৪১)

*অহিংসা*র বিভূতি, *লালসালু*র আক্কাস, *ফাদার সিয়ের্গি* উপন্যাসের চরিত্র নবীন প্রফেসর একই ধরনের ভাবনা থেকে নির্মিত চরিত্র। আক্কাসের পিতা যেমন মজিদের ভক্ত, বিভূতির পিতা মহেশ চৌধুরী তেমন সাধু সদানন্দের অন্ধ ভক্ত। অন্যদিকে নবীন অধ্যাপকের মাতাও সিয়ের্গির অনুসারী ও একনিষ্ঠ ভক্ত। অথচ উপন্যাসগুলোতে এদের পুত্রদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে বিদ্রোহ, তারা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রতিবাদ করেছে। তবে এদের মধ্যে বিভূতি অধিক জীবন্ত। কেননা সেই একমাত্র সদানন্দের মুখের

ওপর অপমান করেছে : 'এঁকে আমার প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয় না। ...বিভূতির অবজ্ঞায় সদানন্দের ভেতর পর্যন্ত টলে ওঠে। বিষয়টি কোনোমতে ধামাচাপা দিতে গিয়ে বলে– প্রণাম নিয়ে আমি আশীর্বাদ বিক্রি করি না মহেশ, আশীর্বাদ করাটা আমার ব্যবসা নয়, ভুলে যাও কেন?' (হায়াৎ মামুদ ২০০৮ : ৪৪৯)

অন্যদিকে মায়ের সম্মান, মায়ের একনিষ্ঠ ভক্তি আর অটল বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে নবীন অধ্যাপক ফাদার সিয়ের্গির ধর্মীয় তত্ত্বকথার অসারতা জানা সত্ত্বেও তাকে কৌশলে এড়িয়ে গেছে। আর স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী নিরীহ যুবক আক্কাস ধূর্ত মজিদের চালের কাছে টিকতেই পারেনি। মজিদের ধর্মীয় উস্কানিমূলক টিপ্পনী নীরবে সহ্য করে ভরা মজলিস ত্যাগ করেছে সে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। এসময়ে রচিত উপন্যাসগুলোতে তিনি ব্যাক্তির সংকট ও পতনের নেপথ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যকেই প্রধান বলে বিবেচনা করতেন। *অহিংসা* উপন্যাসে বিভূতি চরিত্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে এরকমই মার্কসবাদী ধারার ইঙ্গিত বিদ্যমান। তাছাড়া, গ্রামবাসীর সরল বিশ্বাসকে পুঁজি করে বিপিনের আশ্রম-ব্যবসা খোলার পশ্চাতে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্যও যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে।

ছয়

*লালসালু*র মজিদ যেমন এক সময় আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়; তেমনি ফাদার সিয়ের্গির মূল দ্বন্দ্বই হলো আত্মদ্বন্দ্ব; জাগতিক মোহ আর ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন – এই নিয়ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের লড়াকু সৈনিক সে। অন্যদিকে সাধু সদানন্দও ভালোমন্দ, উচিত-অনুচিত প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত চরিত্র। তবে মজিদ শেষপর্যন্ত আস্থা রেখেছে ধর্মবিশ্বাস তথা ঈশ্বর-বিশ্বাসে। কেননা জীবন চলমান। অস্তিত্বের প্রয়োজনে যে মিথ্যের বেসাতি সে গড়েছিল, সেই মাজার জমিলা কর্তৃক অপমানিত হতে পারে, ক্ষেতের ফসল প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হতে পারে, তবু মজিদ জীবন থেকে সরে দাঁড়ায়নি, জীবনের ওপরই আস্থা রেখেছে। অন্যদিকে ফাদার সিয়ের্গি দীর্ঘদিনের অবদমিত কামজ আকর্ষণের কাছে নিজের পরাজয় মেনে নিতে পারেনি। মঠবাসী জীবন, সন্তের জীবন এক নিমেষে ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছে সাধারণের বেশে সাধারণের জনারণ্যে। নারী সান্নিধ্য নয়, ইন্দ্রিয়জ সম্ভোগ নয়, সে জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছে নিঃস্বার্থ ভবঘুরে জীবনের মধ্যে, সাধারণ চাষিবেশে ধনী-গৃহস্থের ক্ষেতে শ্রম দিয়ে, গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে, অসুস্থ রোগীর সেবা করে। অর্থাৎ ধর্মব্যবসায়ীদের মোহজাল থেকে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পেরেছে সে। আর এখানেই তার বিজয়। অন্যদিকে সদানন্দের ঘটেছে ইন্দ্রিয়জ পতন। যে সদানন্দ একসময় বিপিনের আশ্রম ব্যবসাকে মেনে নিতে পারেনি, যার ছিল সুকোমল হৃদয়; সুকুমারবৃত্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে সেই শেষ পর্যন্ত হয়েছে কামনানুভূতির কাছে পরাস্ত।

ফলত, শুদ্ধাচারী জীবন ছেড়ে সে বেছে নিয়েছে মাধবীর সান্নিধ্য, বেছে নিয়েছে পঙ্কিল জীবন, এখানেই তার পরাজয়। সে অর্থে মজিদের প্রতিষ্ঠা যেখানে জীবনবাদিতায়, সিয়েৰ্গি যেখানে মানবতাবাদকে আশ্রয় করে জীবন নির্বাহ করেছে, সেখানে সদানন্দের আত্মসমর্পণ ঘটেছে ভোগবাদিতায়। এটিই মূলত তিনটি উপন্যাসে জীবন মীমাংসার পার্থক্য।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. তল্‌স্তোয়বেত্তাদের ধারণা, কাহিনিটি যেহেতু লেখকের একরকমের আত্মবৃত্তান্ত, তাঁর আত্মার উন্মোচন, সে-কারণেই জীবিতাবস্থায় গ্রন্থাকারে প্রকাশের চিন্তা তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

হায়াৎ মামুদ, ২০১৬। *ফাদার সিয়েৰ্গি* (অনুবাদ), বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড, ঢাকা

আব্দুল মান্নান সৈয়দ, ১৪০৭। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌: অগ্রন্থিত রচনাগুচ্ছ, অপ্রকাশিত আলোকচিত্রাবলী* (ভূমিকাংশ), ঢাকা

সরোজমোহন মিত্র, ২০০৯। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ-২০০৭। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

হায়াৎ মামুদ (সম্পা.) পুনর্মুদ্রণ-মার্চ, ২০০৮। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, অবসর, ঢাকা

সৌদা আখতার, ২০০১। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লালসালু ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সৈয়দ আকরম হোসেন, ২০১০। *প্রসঙ্গ বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

আবদুল কাদির খান (প্রকাশক), ২০০৩। *লালসালু*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

সৈয়দ আবুল মকসুদ, ১৯৮১। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য*, মিনার্ভা বুকস, ঢাকা

জীনাত ইমতিয়াজ আলী, ২০০৬। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

হাসান আজিজুল হক, ১৯৮১। *কথাসাহিত্যের কথকতা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা

খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ২০১৪। *মনঃসমীক্ষাবাদী সাহিত্যতত্ত্ব* (প্রবন্ধ), বেগম আকতার কামাল (সম্পা.), *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, অবসর, ঢাকা